বিজয়

- মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মহসিন আলী

যুদ্ধ তখন দুর্বার গতিতে চলছে। চারিদিকে শুধু গুলি, মেশিনগান, বোমা, গ্রেনেড, মর্টার আর যুদ্ধ বিমানের আওয়াজ। সারা দেশটাই হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র। বাহিরে পা বাড়নোর এতটুকু উপায় নেই। বাড়ির ফটক বা ঘরের দরজা জানালা খুললেই হয়ত মেশিনগানের গুলি বা বোমা গ্রেনেড এসে বাড়ির সবাইকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আবার মূহুর্মূহু বাড়িঘর আকাশ বাতাস ও মাটি কাঁপিয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধ বিমান থেকে বজ্রপাতের মত মর্টার সেল আর কামানের গোলার আঘাতে আঘাতে বাড়িঘর মাটি ধ্বংস বিধ্বংস আর গুড়িয়ে ছাড়খার করছে। কত লোক মরছে। কত বাড়িঘর ধ্বংস হচ্ছে তা কেউ তখন অনুমান করতে পারছে না? কোন কিছুই চোখে দেখার উপায় নেই। বদ্ধ ঘরের মধ্যে ঘাট বা চৌকির নীচে লেপ বালিশ পিঠের উপর চাপিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চুপটি মেরে থাকার অভ্যেস এখন সবারই হয়ে গেছে। রাত দিনের বেশীর ভাগ সময়ই এভাবে কাটে সবার। বাহিরে কি হচ্ছে তা শুধু কানে শুনে অনুমান করা। যখন বিকট শব্দে ভূমির কম্পন হয় তখন সবাই মুখে আল্লা আল্লা করে আর ভাবে- কারা যে এই দূর্ভাগ্যের শিকার হ'ল। হয়ত কয়েকডজন জীবন আর তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হ'ল যাদের দূর্ভাগ্য তারাই শুধু জানছে আর অন্যান্যরা শুধু আল্লা আল্লা করছে যেন আর কারো এ দূর্ভাগ্য না হয়। মৃত্যু অবধারিত ভেবেও সবাই জীবন রক্ষার্থে নিজ বাড়ির মাটিতে নিজে নিজেই হাত পা মুখ বন্ধ করে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় প্রাণীর মত শুধু আল্লা রসুলের ভরসা নিয়ে অসহনীয় যন্ত্রনাদায়ক কঠিন সময় অতিবাহিত করছে।

নাটোর বাংলাদেশের একটি ছোট্ট শহর। কিন্তু দূর্বার মুক্তিযোদ্ধাদের ঠেকানোর জন্য এখানে শত্রু হানাদার পাকসেনারা প্রতিষ্ঠা করে তাদের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার। বনলতা সেন খ্যাত নাটোরের ঐতিহাসিক অপূর্ব কারুকার্যে খচিত বিখ্যাত দীঘাপাতিয়া রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে এই ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার ও উত্তরাঞ্চলের কমান্ড সেন্টার। দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা ও শিরাজগঞ্জ শহরগুলোর কেন্দ্রস্থল নাটোর এবং পদ্মা নদী বরাবর মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী সীমান্তের অদূরবর্তী নাটোর তাই সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড সেন্টার। তাই একদিকে যেমন নাটোর অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করার দূর্গম যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে, অপরদিকে ভারতীয় মিত্র সৈন্যদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য স্থলও ছিল এই নাটোর। আর এরই মাঝখানে নাটোর এলাকার জনসাধারণকেও প্রতিটি মূহুর্ত কাটাতে হয়েছে মৃত্যু, ধ্বংস ও পাশবিক অত্যাচারের ভয়ে।

শর্মিলা তখন নাটোর শহর ছেড়ে প্রায় দশমাইল দূরে আহমদপুর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনসহ সবাই রাতের আঁধারে পালিয়ে এসেছে। সাহেদ গেছে মুক্তিযুদ্ধে। প্রায় দুই মাস আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর আর যোগাযোগ নেই। মাঝে মাঝে খবর আসে। কখনো লালপুর, ঈশ্বরদী বা চারঘাট এলাকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করছে ও মাঝে মাঝে গেরিলা হামলা চালাচ্ছে রাজাকার ও পাকসেনাদের উপর। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে নাটোর শহরে প্রবেশ করা খুব কঠিন। হাজার হাজার পাকসেনা আর তাদের দোসর রাজাকার আলবদর আল শামস ও শান্তি কমিটির সদস্যরা কাঁটা তারের জালের মত নাটোরকে ঘিরে আছে।

প্রায় একমাস হ'ল শর্মিলা তার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সাথে এসেছে আহমদপুরে। সাহেদ তা জানে না। নাটোরের বাড়ি তালাবদ্ধ। তাদের ঠিকানা তারা আর আশ্রয়দাতা ছাড়া আর কেউ জানে না। সাহেদ বা তার লোক তার খোঁজে আসলেও কোন খোঁজ পাবে না। হয়ত শত্রুরা তাদের বাড়িঘর লুটতরাজ করে ভেঙ্গে বা গুড়িয়ে দিয়েছে। সাহেদ হয়ত খবর পেয়েছে বা ভেবেছে যে তারা সব মারা গেছে। শর্মিলা ও তার শ্বশুর শ্বাশুরী সবাই একদিকে সাহেদের জন্য দুঃশ্চিন্তা ও অপরদিকে মুহুর্মূহু যুদ্ধের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্যে পরে প্রতিটি মূহুর্তে মৃত্যু ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে দিন কাটাচ্ছে।

শর্মিলারা বাধ্য হয়েছিল নাটোর শহর ছাড়তে। কয়েকদিন আগে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জেসমিনকে তাদের নাটোরের লালবাজারের বাড়ি থেকে পাকসেনারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেনি। হয়ত তাকে মিলিটারীরা রক্ষিতা করে রেখেছে অথবা অবাধ্য হওয়ার জন্য তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। একটা মহকুমা পর্যায়ে ছোট শহরে অল্প

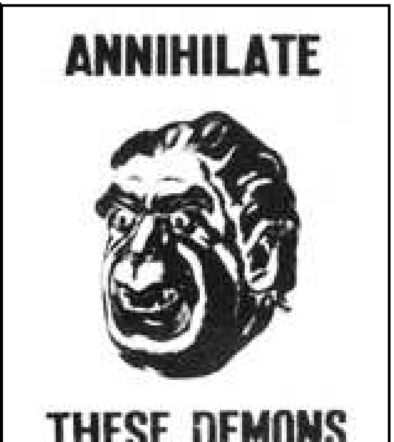

লোকের বাস নাটোর শহর। প্রায় অর্ধেকের বেশীই লোকজন নাটোর থেকে পালিয়ে গেছে। এদিকে প্রচুর সংখ্যক মিলিটারী নাটোর শহরে। শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকাররা কিছুটা চাপে ও কিছুটা তোষামোদী করার জন্য বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে মেয়েদের ধরে পাকসেনাদের হাতে তুলে দেয়। অবাঙালি হাফেজী হুজুরের মসলা অনুযায়ী পাকিস্তান রক্ষায় যুদ্ধেরত পাকসেনাদের মেয়ে সরবরাহ করা ধর্মের কাজ। তাই নাটোরের ঘরে ঘরে সন্ত্রাস পরে গেছে। প্রায় সল পরিবারই তাদের স্ত্রী কন্যা নিয়ে জীবন ও ইজ্জত বাঁচাতে ঘর ছেড়ে গ্রামে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

শর্মিলার আর এক বান্ধবী মণিকাও জীবন ও ইজ্জত রক্ষার্থে পালিয়ে থেকে থেকে অতীষ্ঠ হয়ে গেছে। এ দুনিয়াতে কোথাও যেন তার একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। চারিদিকেই শুধু হায়নার লোলুপ দৃষ্টি। একটু চোখে পড়লেই যেন হাড্ডি মাংস সব মুছরে মুছরে খাবে। মণিকার পিতামাতা অবশেষে এক আধাশিক্ষিত রাজাকারের সাথে তাদের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে মণিকাকে তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। অবশ্য রাজাকার যুবকটির গ্রামে টহল দেওয়ার সময় সুন্দরী মণিকাকে দেখে ফেলে। রাতের আঁধারে সে দলছুট হয়ে একাই হামলা করে মণিকার আশ্রয় দাতার বাড়িতে। তার দাবী, মণিকাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে নতুবা সে মণিকাকে উপভোগ করবে ও রাজাকার ক্যাম্পে এবং পরে পাকসেনাদের দরবারে পৌঁছে দিবে। আর বাঁধা দিলে বাড়ির সবাইকে মেরে ফেলে দিবে ও বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিবে। উপায়ন্ত না দেখে মণিকা চোখ মুখ বুঁজে বিবাহে রাজি হয়ে রাজাকারের শয্যাসঙ্গিনী হ'ল। মণিকা যেন বিষ পান করেও তা হজম করে বেঁচে আছে দৈহিকভাবে যে দেহটাকে শরীয়তিভাবে একজন রাজাকার উপভোগের জন্য ব্যবহার করছে।

সাহেদের সঙ্গে প্রায় কয়েকশত ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। অন্যান্য সহযোগিসহ তাদের সংখ্যা প্রায় হাজারের বেশী হবে। নাটোরের পাশ্ববর্তী থানা লালপুর, রাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম ও সিংড়ায় তারা শক্তিশালী গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করে চলেছে আর প্রায় প্রতি রাতেই কোথাও না কোথাও আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার হিসেবে সাহেদের নাম নাটোর অঞ্চলের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে। পাকসেনা, রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্য, আলবদর ও আল শামস সবাই সাহেদের ও তার দলের নাম শুনলেই কেঁপে উঠে। পাকসেনাদের এক নম্বর তালিকায় সাহেদ। আবার তার ভয়েও পাকসেনা ও তাদের দোসররা সন্ত্রস্ত থাকে। সাহেদের দুই সহযোগী বন্ধু লতিফ আর জাব্বার অন্যতম কমান্ডার হিসেবে সাহেদের সাথে একযোগ মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই তিন বন্ধু একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক তারা দেশে ফিরে এসে নাটোরের পার্শ্ববর্তী থানাগুলোকে তাদের গেরিলা ঘাঁটি ও গেরিলা দল প্রতিষ্ঠিত করে এবং গেরিলা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

সারাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধারা ততক্ষণে নিজ নিজ এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধের ও গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলে শত্রুদের উপর সর্বস্তরে ও সর্বোতভাবে হামলা শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ডাক ও অদম্য আশা তখন বাংলার ঘরে ঘরে প্রসারিত হচ্ছে। অতীব গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর ও অন্যান্য অনুষ্ঠান তখন বাঙালিরা নিয়মিত শুনছে আর মহা বিজয়ের আশায় দিন গুনছে।

হঠাৎ মিত্রশক্তি ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করে ও প্রচুর সামরিক শক্তি নিয়ে শত্রু পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। মুক্তিবাহিনীর আঘাতে পর্যুদস্ত পাকসেনারা মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাথে সাথে কোটি কোটি বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের মহা বিজয়ের যুগ যুগ ধরে লালিত স্বপ্ন সফল হয়। ঘরে ঘরে শুরু হয় মহা বিজয়ের স্বাধীন বাংলার আনন্দের জোয়ার। শর্মিলাও আনন্দে আত্মহারা। তার এই আনন্দ তার জীবনের প্রথম প্রসব বেদনাকে হার মানিয়ে তার মুখে অম্লান হাঁসির ছটা ফুঁটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মহা বিজয়, সাহেদের বিজয়ী বীর হিসেবে ফিরে আসা আর তার মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ী স্বামীকে বরণ করার জন্য নতুন উপহার তার কোলে এসেছে- তাই এবিজয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিজয়।

এদিকে পথে পথে বিজয় মিছিল চলছে। ঢাকা নাটোর, রাজশাহী মহা সড়কে গাড়ি, বাস, ট্রাক ও বিজয়ী জনতার ভিড়ে মুখরিত। শর্মিরার শ্বশুর ও শ্বাশুরী একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে শর্মিলাকে নাটোর হাঁসপাতালে নিয়ে আসছে। মাত্র দশ মাইলের পথ যেন আর শেষ হয় না। শর্মিরা দুচোখ ভরে বিজয় মিছিল দেখছে আর আনন্দ উল-াসের শে-াগান শুনছে। যেন কতদিন শর্মিলা বন্দীশালায় আটকে ছিল। এত

লোক এত গাড়ি এত মুক্ত আলো বাতাস এত হাসি যেন কোন দিন দেখেনি। এত জয়বাংলা শ্লোগান যেন আর কখনো শুনেনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় এই জয়বাংলা শে-াগানই সাহেদ আর শর্মিলাকে এক করেছিল। সেখান থেকে তাদের প্রেম এবং যুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সাহেদের ইচ্ছেতেই তাদের বিয়ে। সাহেদের ইচ্ছে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝে সে শর্মিলার কাছ থেকে একটা উপহার চায়। মুক্তিযুদ্ধের এক অমূল্য রতন উপহার। আর সাহেদের সেই ইচ্ছেকে এতদিন ধরে এত বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে সে লালন করে এসেছে। আর এখন সাহেদের সেই ইচ্ছে পূরণ করার সময় এসেছে। সাহেদের বড় আকঙ্খার উপহার এখন তার হাতের মাঝে। এই বিজয় মূহূর্তে সাহেদ এসেই সে তাকে তার আশার উপহার তার হাতে তুলে দিতে পারবে। এতসব উৎফুল্লের চিন্তা করতে করতে চরম প্রসব বেদনাও যেন শর্মিলাকে দুর্বল করতে পারছে না।

এদিকে গাড়ি আর জনতার শতস্ফূর্ত বিজয় মিছিলের ভিড়ে শর্মিলার বেবী ট্যাক্সী যেন এগুতে পারছে না। আর কয়েকশ' গজ এগুলেই হাসপাতাল। শহরের প্রধান সড়কের এতটুকু পথে কারো পা ফেলাবার উপায় নেই। শর্মিলা জনতার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছে যে কোন মুক্তিযোদ্ধা দেখা যায় কিনা। এই মূহূর্তে যদি সাহেদের দেখা পেত তাহলে সাহেদ নিজ হাতে তার ইচ্ছের উপহারটা গ্রহণ করতে পারত। আর তা হ'ল শর্মিলার সবচেয়ে বড় পাওনা। বিজয় মিছিলের শ্লোগানে শর্মিলার দেহটাও যেন নেড়ে নেড়ে উঠছে। তার ভিতরে এতদিন ধরে লালন করে রাখা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রতীক যেন আর অন্ধকারে থাকতে চাইছে না। বিজয়ের শ্লোগান হয়ত ওর কানেও পৌঁছেছে। আর এ বিজয়ের শরীক হওয়ার জন্য আনন্দ উল-াসে মিছিলে মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে তার অস্তিত্ব ও নবজন্মের বারতা ঘোষণা করার জন্য যেন সে অস্থির হয়ে উঠেছে। মুক্তির নেশায় মুক্ত আলো বাতাসের গন্ধ নিতে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করতে সে আর এক মূহূর্তও অন্ধকারে থাকতে রাজী নয়। দামাল মুক্তিযোদ্ধার মত সেও বিপ্লবী পদক্ষেপে প্রবল গুতিতে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকার থেকে আলোর দুয়ারে। আর সেই বিপ্লবের আঘাতে শর্মিলার সারা দেহে এক বিকট ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ও মা বলে শর্মিলা তার শ্বাশুরীর গায়ের উপর নুয়ে পড়ল।

বেবী ট্যাক্সি ততক্ষণে হাসপাতালের গেটে পৌঁছে গেছে। শর্মিলার শ্বশ্বর চিৎকার করে হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তারদের ডাকতে থাকে। আর শ্বাশুরী ততক্ষণে শর্মিলাকে ছিটের উপর শুইয়ে দিয়ে সদ্যমুক্ত বিজয়কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। হাসপাতালের নার্স ও সহযোগীরা এসে এতক্ষণে স্ট্রেচারে শর্মিলা ও তার বিজয়কে হাসপাতালের মধ্যে নিয়ে চলল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে থেকে শর্মিলা সচেতন রয়েছে এবং জানালা ও দরজা দিকে চোখ মেলে আছে অধীর আগ্রহে সাহেদের প্রতিক্ষায়।

হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তাররা তাদের কাজ শেষ করে শর্মিলাকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুস্থ করে তুলে। প্রথমে নার্সের হাত ধরে ও পরে একা একাই শর্মিলা হাঁটতে শুরু করে। একজন নার্স এসে বিজয়কে শর্মিলার কোলে তুলে দিল। শর্মিলা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে আনন্দোশ্রুতে তার বুক যেন ভেসে গেল। তার শ্বাশুরী পাশে বসে তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে। শর্মিলা তার শ্বশুরকে তাদের বাড়িতে যেতে বলল। হয়ত সাহেদ তাদের খোঁজে এতক্ষণ ওখানে এসেছে। বাড়িতে তালাবদ্ধ ও ধ্বংস অবস্থায় দেখলে হয়ত সাহেদ ভাববে যে তারা কেই বেঁচে নেই। তখন সে আরো অস্থির হয়ে উঠবে। সে তো বিজয়ের উপহার নেয়ার অপেক্ষায় আছে। সে তো এখানো জানে না যে তার বিজয় তার ঘরে পৌঁছে গেছে। খবরটা সাহেদকে জানানোর জন্য এবং সাহেদের হাতে তার বিজয়কে তার বিজয়ের উপহার তুলে দেয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

শ্বশুরকে বাড়ির খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে শর্মিলাও চুপ থাকতে পারল না। বিজয়কে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে শর্মিলা ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালা পাশ দিয়ে শহরের প্রধান সড়ক চলে গেছে। হাজার হাজার লোকের আনন্দ উল্লাসে গগন ফাঁটানো মূহুর্মূহু শ্লোগানে মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের আবেগে আপ্লুত বাঙালিরা আজ আর ঘরে কেউ নেই। রাস্তায় রাস্তায় সবাই একে অপরের সাথে মিশে গেছে বিজয় উৎসবে। ডিসেম্বরের হাল্কা শীত ও মিস্টি রোদে ভরা দিনে বাংলার আবাল বৃদ্ধ বণিতার সাথে সদ্য স্বাধীন বাংলার সবুজ গাছপালা ও প্রাণবন্ত পাখীরাও এক হয়ে যেন মিশে গেছে মহা বিজয়ের পরমানন্দে। শর্মিলা অপলক নেত্রে তা চেয়ে দেখছে আর একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনসঙ্গিনী হওয়ায় গর্ববোধ করছে। তার কোলের বিজয়ও রাজপথের হাজার কণ্ঠের বিজয় উৎসবের শ্লোগানে মায়ের বুকের মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই বিজয়ের আবির্ভাব স্বাধীন বাংলার আবির্ভাব। শর্মিলা ও বিজয় তখন শহরের প্রধান সড়কের দিকে তাকিয়ে আছে সাহেদের অপেক্ষায়। সাহেদকে বিজয় উপহার দেয়ার অপেক্ষায় অপলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল শর্মিলা।

মনে হচ্ছে এই বুঝি সাহেদ আসছে। সাহেদের বীর মুক্তিযোদ্ধার ছায়া, তার বিজয়ের কণ্ঠ ও দ্রুত পদে এগিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বিজয় ও তাকে আলিঙ্গন করার ছবি সবই যেন শর্মিলার সামনে বাস্তব হয়ে ভাসছে। বিজয়কে আকড়ে ধরে হাসপাতালের জানালা দিয়ে অপলক নেত্রে শর্মিলার অপেক্ষা সাহেদের জন্য- তার বিজয়ই মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর জন্য।